উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ৩৫৫ সংখ্যা

ত্রিশঙ্কু কর্ণাটক

তীরে এসে তরি ডুবল বিজেপির। কর্ণাটক রাজ্য সামান্যর জন্য আপাতত হাতছাড়া তাদের। বিজেপি একক গরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার ম্যাজিক ফিগার থেকে মাত্র কয়েকটি আসন আগে তাদের থেমে যেতে হয়েছে। তারই সুযোগ নিয়ে জনতা দল (এস)-এর সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে কংগ্রেস। জনতা দল (এস)-কে নিঃশর্ত সমর্থনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে কংগ্রেস। দুই দলের মিলিত আসন সংখ্যার জোরে জোটের পক্ষে সরকার গড়ার সঙ্গে বিজেপি-কেও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা সম্ভব। পাশাপাশি, বিজেপির আগেই বিজয়ী নির্দল বিধায়কদের নিজেদের দিকে টানার চেষ্টাও শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস। কর্ণাটক দখল করতে পারলে বিজেপি এই প্রথম দাক্ষিণাত্যের কোনো রাজ্যে পা রাখতে পারত। কিন্তু খণ্ডিত জনাদেশের জন্য তা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে কর্ণাটক নিজেদের দখলে রাখার জন্য এবং অন্যদিকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য কংগ্রেস এবং বিজেপি শিবির সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নেমেছিল। কিন্তু রাহুল গান্ধি শেষ পর্যন্ত জিততে পারেননি। কর্ণাটকে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আসেনি। কংগ্রেসের চেয়ে এককভাবে অনেক বেশি আসন পেয়েছে বিজেপি। যদিও ভোটপ্রাপ্তির নিরিখে বিজেপির চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে কংগ্রেস। বিজেপির চেয়ে প্রায় লাখ দেড়েক বেশি ভোট পেয়েছে তারা কিন্তু সেই ভোটকে আসনে পরিণত করতে পারেনি। এটা শুধু কর্ণাটকেই হয়নি, এমন ঘটনা আগেও হয়েছে। সম্প্রতি, ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনেও একই জিনিস দেখা গিয়েছে। ৪৩ শতাংশ ভোট নিয়ে বিজেপি পেয়েছিল ৩৬টি আসন। অন্যদিকে, ৪২.৭ শতাংশ ভোট পেয়েও মাত্র ১৬টি আসন নিজেদের ঝুলিতে আনতে পেরেছিল সিপিএম। আর শরিকদের অর্থাৎ আরএসপি এবং সিপিআইয়ের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ যোগ করলে বামেদের ভোটের হার বিজেপির চেয়েও বেশি। অথচ তারা আসন কম পেয়েছে অনেকটাই। জাতীয় পর্যায়েও এমন ঘটেছে। দক্ষিণের এই রাজ্যটিতে কংগ্রেস ও জনতা দল (এস)-এর সমঝোতা সূত্র অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী হবেন এইচডি কুমারস্বামী। এবারই প্রথম নয়, কুমারস্বামী এর আগেও কর্ণাটকের রাজ্যপাট সামলেছেন। একসময় কুমারস্বামীর সঙ্গেই হাত মিলিয়ে কংগ্রেসের নেতা ধরম সিংকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন বিজেপির ইয়েদুরিয়াপ্পা। সেইবার কুমারস্বামী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু কথা অনুযায়ী কুমারস্বামী নির্দিষ্ট সময়ের পরও ইস্তফা না দেওয়ায় দুই পক্ষে ঝামেলা শুরু হয়। এসব ইতিহাস। তবে দক্ষিণের একাধিক রাজ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্ণাটকেও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকারের বদল ঘটে। গতবার এখানে কংগ্রেস ছিল, এবার তার বদল যে হচ্ছে তা আঁচ করেছিলেন অনেকেই। পালাবদল পর্ব সরাসরি হয়তো সম্ভব হত যদি বিজেপি আর কয়েকটা আসন বেশি পেত। সেক্ষেত্রে দক্ষিণের এই রাজ্যেও ঐতিহ্য বজায় থাকত। কিন্তু আপাতত তা হয়নি। এখানে আপাতত কথাটা ব্যবহার হয়েছে এদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে ঘোড়া কেনাবেচার ধারার দিকে চোখ রেখে। এমন ঘটনার বহু বহু উদাহরণ রয়েছে এদেশে। মাস কয়েক আগে গোয়া সহ উত্তর-পূর্বের মণিপুর রাজ্যে সরকার গড়ার মুখে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে কংগ্রেসকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা নেতিবাচক ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কংগ্রেসের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল বিজেপি। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের আরও একট বড়ো বৈশিষ্ট্য- ভোটে বিজয়ীদের কদর, দাম বেড়ে যাওয়া। জয়ের পরে তাঁদের মতিগতি কখন কোনদিকে যায় কেউ বলতে পারে না, আগাম আঁচ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে বহু ক্ষেত্রেই। আচমকা মত বদল করে উন্নয়নের পক্ষে চলে যাওয়া কিংবা অজ্ঞাত কোনো কারণে ভোটারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে বহু ক্ষেত্রেই জনাদেশেরই আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। কিন্তু সংবিধানে কোনো রেহাই না থাকায় কিছু করারও থাকে না। তেমন কিছু হলে কর্ণাটকেও নতুন কিছু ঘটতে পারে। সব পক্ষেরই যেভাবে তৎপরতা চলছে তাতে অসম্ভব কোনো কিছুই নয়।

অমৃতধারা

যখন তুমি ভালো, উদার, মহৎ, নিঃস্বার্থ, দয়াবান, তখন তুমি তোমার মধ্যে তোমার চারপাশে একটা বিশেষ রকমের আবহাওয়া সৃষ্টি করো এবং এই আবহাওয়া যেন একরকমের জ্যোতিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য। তুমি যেন রৌদ্রস্নাত ফুলের মতো নিশ্বাস নাও, ফুটে ওঠো, তখন আর কষ্টকরভাবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা নয়, কোনো তিক্ততা নয়, বিদ্রোহভাব নয়, নয় কোনো দুরবস্থা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বাভাবিকভাবে আবহাওয়া হয়ে ওঠে আলোকময় আর যে বাতাসে তুমি শ্বাস নিচ্ছ তা যেন প্রসন্নতায় ঠাসা। এ-ই হয় তোমার শ্বাসবায়ু, শরীরে গ্রহণ করছ, শরীর থেকে ত্যাগ করছ, তোমার জাগ্রত অবস্থায় কিংবা নিদ্রিত অবস্থায়, তোমার জীবনকালে কিংবা জীবনের পরপারে পৃথ্বীজীবনের বাইরে, যতক্ষণ না তুমি নবজন্ম গ্রহণ করছ।

প্রতিটা দুষ্ট কাজ চেতনাকে কলুষিত করে, যেন একটা বাতাসের ঝাপটা যা শুষ্ক বিবর্ণ করে দেয় কিংবা যেন একটা শৈত্যপ্রবাহ যা জমাট বেঁধে দেয় অথবা যেন আগুনের হলকা যা কিনা গ্রাস করে নেয়। প্রতিটা সৎ ও সদয়তাপূর্ণ কাজ জন্ম দেয় আলো, প্রশান্তি, আনন্দ -যেন সেই রৌদ্রকিরণ যেখানে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।

-শ্রীমা

শব্দরঙ্গ ■ ১৯৯৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশিঃ ২। উত্তরবঙ্গের একটি নদী ৫। সুগন্ধ কাঠবিশেষ ও তার গাছ ৬। বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায় অভ্যস্ত, বুদ্ধিদীপ্ত বিচারশক্তি সম্পন্ন ৮। খল, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, গোপনে অনিষ্টকারী ৯। আজ্ঞাধীনতা, কর্তৃত্ব, প্রভাব ১১। দখল করে আছে এমন, অধিকারী ১৩। শ্রীরামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভাই, নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা মুনি ১৪। আচার-আচরণ, চাল-চলন, আকার-ইঙ্গিত।

উপর-নীচ ঃ ১। পুরুষদের পরিধেয় শেরওয়ানিজাতীয় লম্বা জামা ২। চিত্ত, অন্তর, বোধ, বিবেচনা ৩। পুত্র, ইন্দ্রের উপবন ৪। মাটির হাঁড়িবিশেষ, ছোটো হাঁড়ি, ডিজেল ৬। সন্ন্যাসীদের আশ্রম বা আখড়া, মন্দির, ঢোল ৭। লেখা, লিপিকার, নতুন শিক্ষার্থী, আনাড়ি লোক ৮। নানাবর্ণযুক্ত, চিত্রবিচিত্র ৯। বিয়ের পাত্র ও পাত্রীর একজন, আশীর্বাদ ১০। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও দ্রুত অগ্রগতিসূচক ১১। প্রথা, নিয়ম বা রেওয়াজ১২। দৈত্য, অসুর ১৩। উৎপত্তি, সৃষ্টি, ইহলোক বা পৃথিবী।

সমাধান ■ ১৯৯৭

পাশাপাশি ঃ ১। আশপাশ ৩। বৈদিক ৫। খরচখরচা ৬। ফিরনি ৭। ভাস্কর ৯। পতিতপাবন ১২। ইরাক ১৩। কবিরাজ।

উপর-নীচ ঃ ১। আশরফি ২। শফর ৩। বৈশাখ ৪। কড়চা ৫। খনি ৭। ভান ৮। রসরাজ ৯। পচাই ১০। তবক ১১। বলাক।

রবীন্দ্রনাথ বনাম নানা রবীন্দ্রনাথ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাস্তবিক, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বাংলার দুর্দশা দেখে দেবযান পরিক্রমারত কোনো দেবদূতই বুঝি আমাদের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে। একজন রবীন্দ্রনাথ যে একটা জাতি বা রাষ্ট্রের কত বড়ো সম্পদ তা আমরা বুঝি। গরিবের ভাঙা ঘরে চাঁদের উদয় যেন বা। যেন বা কাঙালের ঘরে রাজার সম্পদ হঠাৎ কে ফেলে দিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। আমরা বিস্মিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অপ্রস্তুত। এতটা বুঝিবা আমাদের পাওনা ছিল না।

যাতে হাত দিচ্ছেন তাতেই সোনা ফলছে। সোনা যে ফলছে তা রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পারছেন। ধী-সম্পন্ন তিনি এও নিশ্চিত বুঝতে পারতেন যে, আমাদের তুলনায় তিনি বহু বেশি বড়ো। আর বুঝতে পারতেন বলে তিনি অবলম্বন করলেন সতর্কতা। কোনো ব্যাপারে আর নিজেকে ছোটো করতে চাইতেন না। চিঠিটাও লিখতেন সযত্নে, সতর্ক ভাষায়। কথাটি বলতেন প্রস্তুতি নিয়ে, সংযত, সুন্দর, ভাষা ও ভঙ্গিমায়। জানতেন, সকলেরই লক্ষ্যবস্তু তিনি। আর এ ছিল তাঁর নিয়তিও। পারসিক পোশাক, বাঙালি-অসুলভ বর্ণ, আন্তর্জাতিক মানসিকতা--সবমিলিয়ে পিঁপড়ের জগতে হস্তিসদৃশ তাঁর উপস্থিতি। আমাদের অবস্থাও হল অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। তাঁর এক এক সৃষ্টির গায়ে হাত বুলিয়ে ভাবছি, এই বুঝি প্রকৃত রবীন্দ্রনাথ। আর জাদুকর রবীন্দ্রনাথ নিজের ভিতর থেকেই আরও আরও রবীন্দ্রনাথকে বের করে আনছেন একের পর এক। কবি, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক। আমরা থই পাই না, কুল পাই না, রবীন্দ্রের স্রোতে আমরা ভেসে গিয়ে পড়লাম রবীন্দ্রসাগরে।

প্রতিটি রবীন্দ্রনাথই পেতে পারতেন নোবেল পুরস্কার। তবে আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে অন্তত আর একবার গল্পগুচ্ছের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে দিতাম। সংখ্যায় একশোর কাছাকাছি এসব গল্প লিখেছেন এক ছুটি-পাওয়া রবীন্দ্রনাথ। ত্রিশের কাছাকাছি বয়সে শুরু হয়েছিল লেখা। খ্যাতি, অখ্যাতির জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে কিছু দূরে সরে এবং রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা বিস্মৃত হয়ে এবং নিজেকে অবারিত করে লিখতে পেরেছিলেন। নিজের উচ্চপর্যায়ের জীবনচর্চা থেকে কয়েক ধাপ নেমে এসে তিনি কীভাবে প্রবেশ করেছিলেন মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরদোরে, অন্তঃপুরে! তাঁর গোরা বা এলা বা নিখিলেশকে আমাদের চেনা মানুষ বলে মনে হয় না বটে, কিন্তু রামকানাই, ফটিক বা আশুকে চিনতে ক্ষণমাত্র দেরি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের জবানিতে, জমিদারি দেখা উপলক্ষ্যে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকে আমার গল্প লেখারও শুরু হয়। অনুমান, পল্লিগ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের অবতরণ। যুবক রবীন্দ্রনাথের কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা, বিচিত্র অভিযান। এমন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ এদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কিন্তু জন্মসূত্রে পাওয়া অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনুমানের দ্বারা দেখা বা অভিজ্ঞতার যেটুকু ঘাটতি ছিল, তা অনায়াসে পূরণ করে পল্লিবাংলার একেবারে প্রাণ অন্তঃপুরে পৌঁছে যেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। তখনও তাঁর বৃহৎ কর্মকাণ্ড শুরু হয়নি, সেভাবে শুরু করেননি তাঁর পরিভ্রমণ। জীবনের ব্যস্ততম দিন সেগুলো নয়। বরং বোটে বা নদীর ধারে পল্লিগ্রামের কাছ ঘেঁষে একটু অলস, বাক্যহীন, কর্মহীন সময় কাটিয়েছেন। আর তাই এত প্রাঞ্জল, এত খুঁটিনাটি বিবরণে ভরা তাঁর গল্পগুলিতে উপচে পড়েছে জীবন। সে এক অনবদ্য সুসময় বঙ্গ সরস্বতীর। গল্প যে শুধু বাস্তব ঘটনার চাক্ষুষ বিবরণ নয়, নয় সংবাদ, তাঁর চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে? বাংলা গল্পের সেই উন্মেষকালের অগ্রপথিক এই সত্য বুঝতে পেরেই অন্তরের জারক রসে সিক্ত করে নিলেন তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে। জাদু-কলমে লিখে চললেন গল্পের পর গল্প। পরতে পরতে খুলে যেতে লাগল পল্লিগ্রাম, মানুষ, মানুষের রাগ,

চিঠিটাও লিখতেন সযত্নে, সতর্ক ভাষায়। কথাটি বলতেন প্রস্তুতি নিয়ে, সংযত, সুন্দর, ভাষা ও ভঙ্গিমায়। জানতেন, সকলেরই লক্ষ্যবস্তু তিনি। আর এ ছিল তাঁর নিয়তিও। পারসিক পোশাক, বাঙালি-অসুলভ বর্ণ, আন্তর্জাতিক মানসিকতা--সবমিলিয়ে পিঁপড়ের জগতে হস্তিসদৃশ তাঁর উপস্থিতি।

ঘৃণা, ভালোবাসা, লোভ, পাপ--সোজা কথায় মানুষের অনন্ত অভ্যন্তর। চালচিত্রের মতো, পেখমের মতো ফুটে উঠতে লাগল পটভূমির প্রকৃতি।

রবীন্দ্রনাথ কতদূর আধুনিক তা নিয়ে আজকাল নানা প্রশ্ন ওঠে। তাঁর সমস্যা হল, তিনি প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের পুরুষ। তাঁর পক্ষে সব সনাতনকে ঝেড়ে ফেলে আদ্যন্ত আধুনিক হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। অথচ মজার কথা হল, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাতও তাঁর হাতে। কবিতাতেই যেহেতু ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো বাজি। তাই রবীন্দ্রনাথকে কাঠগড়ায় তুলতে হলে তাঁর কবিতা ধরেই টান মারা হয়। কবিতার কথা এখানে উহ্য থাক। কিন্তু আধুনিকতার অভাবজনিত দায়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না, যতদিন গল্পগুচ্ছ থাকবে।

তাঁর সমসাময়িক বা অনতিপূর্বে সারা বিশ্বে যত লেখক ছোটোগল্প লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কারও চেয়ে ন্যূন ছিলেন না। অন্তত আমরা যতদূর পড়তে পেরেছি। একরাত্রি, মধ্যবর্তিনী, গিন্নি, ক্ষুধিত পাষাণ, সমাপ্তি, নিশীথে--বারংবার বিশ্লেষণ করে দেখেছি, কত সামান্য আয়োজনে কী অকিঞ্চিৎকর উপাদান নিয়ে তিনি মানুষকে সত্যের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারেন।

ছোটোগল্প ও কবিতার নৈকট্য নিয়ে কথা হয় আজকাল। রবীন্দ্রনাথ নিজে ষোলোআনা কবি হয়েও এই ভুলটা করেননি। তাঁর কবিতাকল্প ভাষাকে তিনি গদ্যের নিয়মেই সাজিয়েছেন। অনাবশ্যক লিরিককে বেনো জলের মতো ঢুকিয়ে আবিল করতে দেননি গল্পের নির্মাণ। এ কত বড়ো সংযম, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। অথচ কবিতা যে শুদ্ধতার অভিসারী, ছোটোগল্পেই সেইখানে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পেরেছেন তিনি। বহুকাল অবধি বাল্যে পড়া ছুটির ফঠিকের কণ্ঠে এক বাঁও মেলে না... দো বাঁও মেলে না... কানে বেজেছে। কতবার স্টিমার যাত্রায় শুনেছি ওই ঘোর রব। কিন্তু মৃত্যুর অতলান্ত রহস্যের গভীরতা মাপতে যে ওই চিৎকারটিকে এমনভাবে কাজে লাগান, এত অবিসংবাদীরূপে তা ভেবে আজও শিউরে উঠি।

রবীন্দ্রনাথের যে দুর্বলতাটির কথা তাঁর ঘোরতর ভক্তও স্বীকার করবে, তা হল অতি কথনের ঝোঁক। কথার নেশা ছিল তাঁর। বলতেও পারতেন সুন্দর। তাই অনেক সময়ই বিষয়বস্তুকে ঘিরে এক বিপুল লুতাতন্তুজাল রচনা করে থাকতেন। পড়তে পড়তে কতবার খেই হারিয়ে ফেলেছি তাঁর প্রবন্ধের। উপন্যাসে ছিল অনাবশ্যক বিস্তার। এই বাহুল্য অবশ্য সুখপাঠ্যও ছিল। কিন্তু হারিয়ে ফেলত তীক্ষ্ণতা, প্রাসঙ্গিকতা, উদ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া। পৌঁছোনোর চেয়ে চলাটাই বোধকরি তাঁর বেশি প্রিয় ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই, তাঁর গল্পে কদাচিৎ এরকম বাহুল্যের দেখা মেলে। বেশিরভাগ গল্পে যতটুকু না বললেই নয়, ততটুকু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। একটি বাক্যকে নড়ানো যায় না সেখান থেকে। অবশ্য পরবর্তীকালের কিছু গল্প বাদে।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা গল্পে অনেক বিবর্তন ঘটেছে। পার হয়ে গেছে কয়েকটি প্রজন্মের সাহিত্যচর্চা। গল্পের রূপান্তর ঘটে গেছে অনেক। তবু আজও বাংলা ভাষায় এমন গল্প প্রচুর পরিমাণে লেখা ও ছাপা হয় যা রবীন্দ্রযুগকে অতিক্রম করতে তো পারেইনি, বরং সূক্ষ্মদৃষ্টির অনুভূতি ও অনুমান শক্তির অভাবে তা অন্যমনস্ক, অবিদগ্ধ পাঠকের অলস অবসর বিনোদনের উপাদান হয়ে থাকে মাত্র। বোঝা যায়, বাংলা ছোটোগল্পের যে বিবর্তন ঘটেছে তার ক্ষেত্র খুবই স্বল্প পরিসর। আর আজও যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বহুল পরিমাণে পঠিত হয়, তার কারণ এইসব গল্পের বিশ্বজনীনতা, কালাতিক্রমী গুণ। পরবর্তী ছোটোগল্পে যতই বিবর্তন ঘটুক, তাতে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাতিল হয়নি, হবেও না।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন নানা রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, তখন বোধকরি এক একসময়ে তাঁর সন্দেহ হত তিনি যথার্থই আমাদের লোক কিনা। তাই কবির আর্তস্বরে প্রকাশ পেয়েছিল এই ঘোষণা, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক। জবাবে মোক্ষদা ঝি-এর কণ্ঠস্বরে আমাদের বলতে ইচ্ছে করে মরণ। আমাদের লোক নও তো তুমি কাদের লোক গো রবিবাবু? এই যে আমরা ছড়িয়ে আছি তোমার গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায়, কোথায় কোন আঘাটায় পড়ে থাকা সামান্য মণিষ্যিদের বুকে তুলে নাওনি তুমি? ঠাঁই দাওনি পুঁথির পাতায়? যতই জোব্বা দিয়ে ঢাকো নিজেকে, যতই বিশ্বকবি কপচাক লোকে, আমরা ঠিক জানি তুমি কাদের লোক।

(সমাপ্য)

রবীন্দ্রনাথের যে দুর্বলতাটির কথা তাঁর ঘোরতর ভক্তও স্বীকার করবে, তা হল অতি কথনের ঝোঁক। অনেক সময়ই বিষয়বস্তুকে ঘিরে এক বিপুল লুতাতন্তুজাল রচনা করে থাকতেন

সোজা-সাপটা

জনমত

বহু প্রাথমিক স্কুলে বেঞ্চ নেই, তেমনি নেই পড়াশোনাও

গত ৮ মে প্রকাশিত তমালিকা দে-র 'সরকারি জুতো পরে না প্রাথমিকের পড়ুয়ারা' শীর্ষক প্রতিবেদনটি খুব সুস্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করছে সরকারি দান খয়রাতির অকার্যকারিতা। লোকরঞ্জনের উদগ্রতায় ভেসে ছাত্রছাত্রীদের বই, পোশাক, জুতো, টেস্টপেপার, খাবার-দাবার প্রভৃতিকেই যদি এমনি করেই বিলিয়ে দেওয়া হতে থাকে, তাহলে এসবের কোনো মূল্যই থাকে না। প্রতিবেদক এইভাবে জুতো বিলিয়ে দেবার এক প্রহসনকে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রাথমিক ক্লাসরুমগুলোতে বেঞ্চই নেই। জুতো পরলে তো পা ঝুলিয়ে বসতে হবে। বেঞ্চের অভাবে সারের বস্তার উপর ছাত্রছাত্রীরা তো জুতো পরে বসতেই পারবে না। কাজেই সরকারি কোশাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে গোটা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে জুতো বিলির বন্দোবস্ত করা হল সে সব টাকাই জলে গেল। মাঝখান থেকে টাকা নিয়ে গেল ঠিকাদাররা। প্রাথমিকের পড়ুয়াদের স্কুলের পোশাকও তথৈচ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে সব পোশাকগুলোর রং জ্বলে যায়। পোশাকগুলো কোনোটি হয় আঁটোসাটো আবার কোনোটি হয় ঢলঢলে। অথচ পোশাক পিছু সরকারের ব্যয় কিছু কম নয়! নিম্নমানের পোশাক দিয়ে ঠিকাদাররা লক্ষ লক্ষ টাকা পকেটস্থ করছে। গ্রামের অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিকে এই ঠিকাদাররাই নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বশিক্ষা মিশনের আওতায় বিগত ১২-১৪ বছর ধরে প্রতিটি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলোকে লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে তাদের স্কুল বিল্ডিংগুলোকে সংস্কার করার জন্য। কিন্তু বিল্ডিং নির্মাণের ২-৩ বছরের মধ্যেই কোথাও ছাদ ধসে পড়েছে কোথাওবা দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে। অর্থাৎ লাভ সেই ঠিকাদরেরই।

একটা ঠিকাদারকেন্দ্রিক সমাজ থেকে গ্রামীণ জনতা, ছাত্রছাত্রীরা আর কী প্রত্যাশা করবে ? প্রতিটি সরকারি অফিসে ঠিকাদারদেরই ভিড়। মাঝেমাঝেই স্কুলগুলোতে বিলি করবার শতসহস্র সাইখেল কখনো গোডাউনে, কখনো খাদ্য দপ্তরের অফিসে, কখনো রবীন্দ্র ভবনে, কখনোবা খোলা আকাশের নীচে পচবার ছবি ভেসে ওঠে। বিডিওদের জিজ্ঞেস করলে বলা হয়, স্থানের অভাব, তাই রবীন্দ্র ভবনেই রাখা হয়েছে। শত শত কোটি টাকার সাইকেল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর যে সাইকেলগুলি বিলি করা হয়েছে সেগুলোর আয়ুষ্কাল ছয় মাস, বড়োজোর এক বছর। এখন শোনা যাচ্ছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের ছাত্রীদের স্কুলে ডেকে নিয়ে এসে অক্ষয়কুমারের সিনেমা দেখানো হবে। এবং অবশ্যই সেটা বিনা পয়সায়। ছাত্রীদের স্কুলে ভেন্ডিং মেশিন বসানো হবে। অথচ প্রাথমিক স্কুলের বিল্ডিংয়ে জানালাই নেই! ভেন্ডিং মেশিন সরবরাহের জন্য বিরাট সংখ্যক ঠিকাদার এরই মধ্যে স্কুল কলেজগুলোতে লাইন দিচ্ছে।

দান খয়রাতি করতে করতে এমন একটা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে, যেখানে গ্রামীণ জনতা ভাবতে শিখেছে প্রাথমিক স্কুল মানেই মিড-ডে মিল, বিনা পয়সার পোশাক, জুতো, আয়রন ট্যাবলেট এসব। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শিখেছে কলেজে ঢুকলে কোনো বেতন দিতে হয় না। বরং মাইনোরিটি লোন পাওয়া যায়। ইউনিয়ন ফান্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে। সেই টাকা দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যথেচ্ছ বেলেল্লাপনা করা যায়, মদ খাওয়া যায়, ছাত্রীদের সর্বনাশ করা যায়। দান খয়রাতির বিষে বিষে স্কুল কলেজ নীলাভ হয়ে উঠেছে।

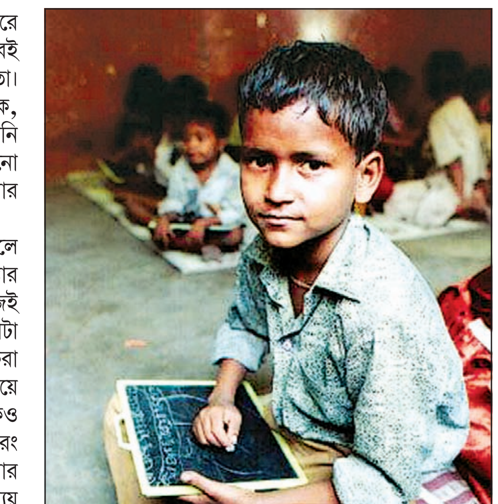

এপ্রিল মাসে পঞ্চায়েত ভোটের নমিনেশনের দিন আরও এক ঘটনা নজরে আসল। গ্রামগুলোর বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সেদিন আর স্কুলে আসেনি। গ্রামগুলোতে সেদিন কালো রংয়ের প্লাস্টিকের ত্রিপল টাঙিয়ে ভূরিভোজের আয়োজনে যোগ দিয়েছে সববয়সি লোকজন, ছাত্রছাত্রীরাও ? কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের নমিনেশনের দিন ছাত্রছাত্রীদের মাংসভাত খাওয়ানো হচ্ছে কেন ? নেতারা উত্তর দিয়েছেন, ছেলেমেয়েদের মাংসভাত খাওয়ালে তাদের অভিভাবকরা নাকি খুশি হবেন।

প্রাথমিক স্কুলে যেমন বেঞ্চ নেই, তেমনি পড়াশোনাও নেই। ক্লাস ওয়ান-টুয়ের শিশুদের কথা থাকুক, গ্রামের স্কুলগুলোর ক্লাস এইট-নাইনের ছাত্ররাও ফ্লাওয়ার, সয়েল, আর্থ, ওয়ার্ল্ড এমনকি ওয়ার্ড বানানটাও শুদ্ধ করে লিখতে পারছে না। উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশেরই সূর্যগ্রহণ, তাপবিকিরণ, হিমাঙ্ক প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিতি ঘটছে না। কলেজ স্তরের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী সেন্টেন্স বানানটা লিখতে পারছে না। সেন্টেন্সড্ টু ডেথ কথাটির অর্থ কলেজস্তরের শতকরা ১০০ ভাগেরই অজানা। এসব নিয়ে কারুর কোনো আক্ষেপও নেই, ক্ষোভও নেই। যে বয়সে ইকোনমিকস পড়বার কথা, তারা ইকোনমিকস সাব্জেক্টটা চোখেই দেখেনি। দান খয়রাতির পরিমণ্ডলে লেখাপড়া যে কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, সেটা ধীরস্থিরভাবে ভাবলে হাড় হিম হয়ে যায়। বিএ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ব্যাচেলার অব আর্টস কথার মানে জানেই না। এর চেয়ে পরিতাপের আর কী হতে পারে ?

শান্তনু বসু, অধ্যাপক
চাঁচল কলেজ, মালদা।

মনে হিংসা, মুখে প্রেম

অহিংসার প্রতিমূর্তি জাতির জনক গান্ধিজির জন্মসার্ধশতবর্ষ আসন্ন। প্রধানমন্ত্রী ঘটা করে এ নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন। হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীরাও। আমার প্রশ্ন, গান্ধিজয়ন্তী পালনের অধিকার কি বর্তমান দিনের রাজনীতির কান্ডারিদের আছে ? তাঁদের তো মনে হিংসা, মুখে প্রেম। দেশজুড়ে এখন যে অশান্তির বাতাবরণ, তার জন্য তো তাঁরাই বেশিরভাগ দায়ী। আগে তাঁরা নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পালটান, পরে না হয় গান্ধিজয়ন্তী পালন করবেন।

সামিম আখতার বানু
সোনাবাড়ি, রায়গঞ্জ।

ক্ষমার অযোগ্য

সম্প্রতি ভাগাড়ের মাংস বিক্রির ঘটনায় মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই জঘন্য কাণ্ডে রাজ্য সরকার নড়েচড়ে বসেছে। আমরাও আশা করব সীমাহীন লোভের তাড়নায় যে সমস্ত ভেজালকারীর দল মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে এসেছে তারা যেন আইনের বলে কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা পায়। ভাগাড় কাণ্ডে জড়িতরা ক্ষমার অযোগ্য। তাদের শাস্তি দিলেই স্বস্তি পাওয়া যাবে।

অরবিন্দকুমার সেন
মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি।

খামে সমস্যা

বর্তমানে পোস্ট অফিস থেকে পাওয়া খামে এমনভাবে আঠা আটকানো থাকে যেটা খুলতে গেলে খাম ছিঁড়ে যাচ্ছে। জলে ভিজিয়ে রেখে অনেক কষ্ট করে খুলতে হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত খোলা খাম পাওয়া যেত। লেখার পরে লেখক-লেখিকা আঠা দিয়ে আটকে তা পোস্ট করত। বর্তমানে এভাবে আঠা আটকে খাম দেওয়ার কী কারণ জানি না। ডাকঘর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, এভাবে আঠা আটকে খাম দেবেন না। এতে অসুবিধা হচ্ছে।

শিপ্রা শিকদার
মোহন্তপাড়া এক্সটেনশন, জলপাইগুড়ি।

সংশোধনী

'বনে ফল নেই গাছে, বানরকুল অসহায়' শীর্ষক একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে গত ১২ মে। সেখানে নামে ভুল ছিল। পত্রলেখক সঞ্জীবকুমার দত্ত-এর স্থলে পড়তে হবে সমীরকুমার দত্ত।

ময়নাগুড়ি রোডে উড়ালপুল চাই

ডুয়ার্সের দ্বার ময়নাগুড়ি রোড। এই স্থান দিয়ে ডুয়ার্স তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সব যানবাহন চলাচল করে। বর্তমানে রেলগাড়ি চলছে ময়নাগুড়ি রোডের উপর দিয়ে। ফলে রেলগেট বন্ধ করলে তীব্র যানজট হচ্ছে। এতে জরুরি পরিসেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে এই জটে। রেল পরিসেবা পাচ্ছে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা, এটা আনন্দের। কিন্তু সড়কপথ আটকে এইরূপ পরিসেবা চায় না উক্ত অঞ্চলবাসী। যানজটে প্রচুর ক্ষতি হয়। এমনকি সঠিক সময়ে পৌঁছাতে না পারায় অনেক রোগী মারা পর্যন্ত যাচ্ছে। এই জটের ফলে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেন না অফিসযাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আবার দুর্ঘটনাও ঘটছে ওই যানজটের দরুন। জাতীয় সড়ক সবসময়ে খোলা থাকবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী এই ময়নাগুড়ি রোডে যানজটের ফলে দেশের একটা অংশের বড়ো ক্ষতি হচ্ছে। সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তবুও উড়ালপুল হচ্ছে না ময়নাগুড়ি রোডে। রেলপথ এবং সড়কপথ সমানতালে চলুক এটাই চায় ময়নাগুড়ি রোডবাসী। সত্বর উড়ালপুল তৈরি করা হোক ময়নাগুড়ি রোডের উপর দিয়ে, এটাই আশা করব।

দেবীপ্রিয়া ব্যানার্জি
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

শক্তিশালী গণতন্ত্র চাই

দেশে শক্তিশালী এক গণতন্ত্র কামনা করি, দেশ ও মানবতার জন্য। দেশ আজ অস্থিরতার মুখে দাঁড়িয়ে। একদিকে অখণ্ড জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ আর রাজনীতির সন্ত্রাস। গণতন্ত্র কী, গণতন্ত্র কাকে বলে এবং গণতন্ত্রের সুফলই বা কী ? ভারত কি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ? আমি বলব, না। কারণ এখানে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধাদান করা হয়। আমরা অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাক্ষী। তাছাড়া রাজনৈতিক মদতে হত্যা তো আছে। গুজরাটে দাঙ্গা দেখেছি। যোগী ক্ষমতায় আসার পর উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গোমাংস খাওয়ার অপরাধে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এরাজ্যে বাম আমলে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, খানাকুল, খেজুরি, আঠারোকোঠায় নিধন যজ্ঞ চলেছিল বামেদের আমলে। আর বর্তমানে তৃণমূলের চমৎকার গণতন্ত্র। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যা দেখলাম তাকে কী বলা যায়? মানুষ মেরে যারা রাজনীতি করে তারা কি দেশের মঙ্গল করতে পারে ?

হান্নান রসিদ
কেশরীবাড়ি, চিলকিরহাট।

ধন্যবাদ

গত ৬ মে ভোরবেলায় যখন আমি রেডিয়ো খুললাম তখন দেখলাম- নিয়মমাফিক অনুষ্ঠানগুলির বদলে কী সব ভাষ্য চলছে। পাখিদের নানারকম কলতান, কিচিরমিচির হচ্ছে। ভাবলাম, আমার কি আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র ধরতে ভুল হচ্ছে ? তবুও আমি ধরে রাখলাম। শুনলাম নানারকম পাখির কিচিরমিচির। ভোরবেলা মনটা খুব আনন্দে উল্লসিত হল। তারপর ভুল ভাঙল। ৭ মে যখন বাড়িতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ এল তখন বুঝতে পারলাম, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো মানুষের সঙ্গে পাখিদের আত্মিক যোগাযোগ ঘটাতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে। চাপড়ামারির জঙ্গলে ময়ূর সহ শত শত পাখির ডাক আমরা ২১টি দেশে শুনলাম। এমন স্মৃতিমধুর বিরল ঘটনার জন্য ধন্যবাদ জানাই অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর আধিকারিক ও প্রযুক্তিবিদদের, ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে।

মমতা চক্রবর্তী, উত্তর রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।